বাঙ্গালার টেরাকোটা

কমলকুমার মজুমদার

মুখখানির দিকে চাহিয়া আমরা অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠি, যদি কখনও নির্ভয়ে মনের কথা বলিবার সুযোগ লাভ করি তাহা হইলে, ডাগর সাহসে বলিব বেদান্ত এই সৌন্দর্য্যকে বিদ্রুপ করিতে পারে না। কেন না দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদ্বয়, কেন না অধরে স্মিতহাস্য রেখা এবং পদ্মপত্রস্থিত জলকণার লাবণ্য এখানে বেপথুমান।

এ মুখ স্মরণে অসংখ্য গীতিকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, অনেকে বিষয় ত্যাগ সন্ন্যাস লইয়াছে, বহুর হৃদয় এ মুখখানি গভীরতরে অন্য নাম।

"এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা কেমনে আইন বাটে" এই পদ আবৃত্তি করিতে করিতে কতবারই না আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়াছি, অলৌকিক মায়া আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে, ছায়া নীল এবং সৌরলোক পড়শী হইয়াছে, আর যে নিশ্বাস সুদীর্ঘ রেখায় র ূপান্তরিত।

অথবা "যেন কান্দিয়া আঁধার গগন(?) চাঁদের স্মরণ লইল আসি" পদটির মধ্যে যে বর্ণ উচ্ছ্বসিত, যে মাধুর্য্য বিপুল সেই অনুভব লাভ করি। আমরা যেমন বা প্রতীক হইয়া যাই।

ইনি কৃষ্ণপ্রাণাধিক রাধা।

কাংড়া কলমে, রাজস্থানী চিত্রে বহু প্রাচীরগাত্রে ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি।

ঐতরেয় উপনিষদ যাহাকে "যদেত বৃদয়ং ..... সঙ্কল্পঃ..... ভবন্তি।।২।।" সঙ্কল্প বলেন, অর্থাৎ কোন একটি রূপের শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে সঙ্কল্প বা সম্যক কল্পনা এই লীলার অধিষ্ঠাত্রী রাধা। উজ্জ্বল নীলমণি যাঁহার অগণিত ভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পদাবলী উদাত্ত কণ্ঠে যাঁহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে।

রাধিকার প্রতিমা, প্রাচীন বেলে পাথর, কষ্ঠি পাথরে, উল্লেখ বড় একটা নাই, টেরাকোটাতেই অধিক, (ধাতু নির্মিত যদিও দেখা যায়) বিষ্ণুপুরের রাধা এক আশর্চ্য্য প্রতিমা, দেহ সৌষ্ঠব উচ্ছলিত হইয়া কোন শুভ মুহূর্তে রেখায় এবং রেখা প্রমুখ াৎ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাসুদেবের মন্দিরে, গুপ্তিপাড়ায়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে, সোনতোড়ে, কালনায় যদিও এই সকল মন্দিরের টেরাকোট

ার আকার সোনতোড় ব্যতীত ছোট তবুও এগুলি একই সৌন্দের্যের অধিকারী, মুখমণ্ডল অঙ্গাকরণ নিঃসন্দেহে বলা যায় সকল স্থানের একই ধরনের নহে।

প্রায় মন্দিরে, নৌকাবিলাস এবং বস্ত্রহরণের স্মৃতি আমরা দেখিতে পাই। কেন না, কৃষ্ণ রাধার প্রাণভ্রমর হইলেও তিনি গে াপীজনবল্লভ। গোপীজনেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে যে গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা হিন্দু জনসাধারণকে বলা ধৃষ্টতা মাত্র। ফলে প্রায় মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে, রাশমাশুল দেখিতে পাই। সকল সময়ই যে এই রাশমণ্ডল, অবশ্যই মধ্যবর্তী স্থানে থাকে এমত নহে, সোনতোড়ে একান্তে, এবং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যতিত্রম দেখি, বাসুদেবের মন্দিরে। রাশমণ্ডল পূর্ব দক্ষিণ কোণে নিম্নে গাঁথা।

রাশমণ্ডলের কল্পনা সংযম ও শ্রদ্ধার শেষ বাক্য। মেদিনী অভিদান রাস শব্দে, কোলাহল ধবনি, ভাষা, শৃঙ্খল এবং গে াপদিগের (গোপানাং) ক্রীড়াবিশেষ বুঝায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠানাঁ অন্যোন্যস্য করশ্রিয়াম্।

নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্।

"পরস্পর হস্তধারণ পূর্বক নটের সহিত সঙ্গীতকালীন মণ্ডলাকারে নর্ত্তকীদিগের নৃত্যই রাস। "রাস" বাক্যের ইদানীং কালের অর্থ এইরূপ।

কিন্তু যে ভাগবতের লেখক ব্যাসদেব; বক্তা আবাল্য ব্রহ্মচারী পরমযোগী শুকদেব, এবং শ্রোতা মৃত্যু প্রতীক্ষারত রাজা পরীক্ষিত। সেখানে "রাস" বাক্যের অর্থ আর এক, যোগ ব্যতীত সে অর্থ-উপলব্ধি করা যায় না।

কেন না, "রাস" আদিরসাত্মক ক্রীড়া নাহে, উহা বৈরাগ্যজননী ক্রীড়া।

তাভিঃ সমেতাভিদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃত।
উপগীয়মান উদগায়নবনিতাশতযূথপঃ
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়নবনম্।৪২

ভাবার্থ। সেই সমুদয় গোপীগণ দ্বারা কৃষ্ণ মিলিত নক্ষত্রমালাপরিশোভিত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহার দর্শনে প্রসন্নবদনা, এবং ভগবান হাস্য দ্বারা, কুন্দকুসুমসদৃশ শোভায় শোভিত হইয়া ছিলেন। সেই রক্ষকশূন্য ভীষণতাময় অরণ্যে গোপীদিগের সর্ব প্রকারে রক্ষক হইয়া উপগায়নরীতিতে কৃষ্ণনাম গান করিয়াছিলেন এবং সেই গোপীপ্রদত্ত নানা পুষ্পরচিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা সংসারকে যে গোপী সমূহ জয় করিয়াছে, সেই বেষ্টনাকারে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ গোপীমালাকে ধারণ করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ ভক্তত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন) শ্রী কৃষ্ণনাথ ন্যায়কত্ব; 'রাস পঞ্চাধ্যায়'।

রাসমণ্ডল জীবনচক্রের অন্যতম ভাবনা ব্যতীত অন্য নহে, কোথাও ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও অণাভ, ইহা যে শুধুমাত্র বৈষ্ণব মন্দিরেই দেখা যায় তাহা নহে, শাক্ত শৈব মন্দিরের সম্মুখেও বর্তমান।

জয়দেব বলিয়াছেন, "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি ললিত কলাপ কৌতুহলম, শৃলুতদা জয়দেব সরস্বতীম।" তবু বাসুদেব অথবা গুপ্তপাড়ার মন্দিরে দুইপার্শ্বের সুদীর্ঘ ছক কাটা প্রাচীর গাত্র আমাদের মনহরণ করে। কোথাও আলিঙ্গনবদ্ধ, কোথাও কৃষ্ণ কোলে রাধা, কোথাও মুরলীধর, এ দর্শনে শ্রীহরিকে স্মরণ-মনন-দর্শন হয়।

প্রত্যেকটি আলেখ্য দিব্য, কাজের মধ্যে গাম্ভীর্য এবং নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা আছে এগুলি ছাঁচে করা। ছাঁচে অবশ্য মাটির কাজ করাই নিয়ম, কারণ ভিজা মাটিতে করার পর টেরাকোটা পুড়াইতে হয়, ফলে তাপের উপর সমস্ত কাজটি নির্ভর করে।

কিন্তু আমরা যদি যত্ন সহকারে এ-সকল টেরাকোটাগুলি দেখি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে ছাঁচ করার পরও শিল্পী অনেক কাজ করিয়াছেন যাহা ছাঁচে অসম্ভব।

যুগল-মিলন, অথবা অন্যান্য কৃষ্ণলীলার কথা, যথা বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস, অনেক মন্দিরেই আছে। বিষ্ণুপুরের নৌকা বিলাস রেখাছন্দের এক অপূর্ব স্বরগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে, নিম্নে উত্তাল তরঙ্গ --- তাহার উপরে অসহায় নৌকা, নৌকায় ভীত আর্ত শঙ্কিত গোপীযাত্রী বৃন্দ, সেখানে গোপীজনবল্লভ এইরূপ কল্পনা আমরা বাসুদেবের প্রাচীর গাত্রে দেখি, টেরাকোটার আয়তন ছোট, কিন্তু একই উদ্বেলতা একই বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত।

"বস্ত্রহরণে" সোনতোড়ের কাজটি আয়তনে বেশ বড়, কালনার শিব মান্দিরের অনেক পরের এবং আয়তনে বেশ ছোট, ফলে গাছটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, মধ্যে "কৃষ্ণ" নিম্নে জলরেখার ধাঁধার মধ্যে নগ্ন, সুন্দর, বিপুল দেহভার নিপীড়িত গোপীবৃন্দ। যে দেহ মর জগতের পুষমানুষের চিরবিস্ময়, যে দেহের জন্য দেবগণ উন্মাদ, ঋষিকূল ভ্রষ্ট, জনসাধারণ বিকল সে দেহের প্রতিবিম্ব এইখানে উল্লেখিত হইয়াছে।

"তারাপীঠ" ব্যতীত কৃষ্ণ রাধা প্রতিমার প্রায় সর্বত্রেই একই ধরণের, আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, রাধারভাব অসম্ভব বঙ্কিম। তারাপীঠের কৃষ্ণ, রাধা গোপীনীরা সকলেই বিস্ময়কর ভাবে দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় ইদানীং কালের পাশ্চাত্য প্রভাবিত কাজ। মুখমণ্ডল, সুদীর্ঘ পদদ্বয়, রাধা গোপীবৃন্দের অঙ্গাভরণ সমস্তই এক নতুন ভাবে পরিকল্পিত।

এখানে, তারাপীঠে, অন্যান্য টেরাকোটা ইটের বিষয়বস্তু অভিনব, এবং যে মৃত্তিকাদ্বারা এই সকল ইট নির্মিত তাহা ভিন্ন

প্রকৃতির। প্রতেকটি ইটের রঙ কালচে লাল, অনেক জায়গায় ইট পাথর বলিয়া ভ্রম হয়। বিষয়ের মধ্যে একটি "পাঁঠাবলীর" দৃশ্য আছে, ইলচোরার দাসেদের মন্দিরের একটি পাঁঠাবলীর দৃশ্য (এখন জীর্ণ) আমরা দেখিয়াছি।

দেবীপুর লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের কৃষ্ণের বা রাধার দেহসৌষ্ঠব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে সমস্ত রূপই 'নিটোল'। যদিও এ-মন্দির খুব পুরাতন নহে (দেবীপুরের নিকটে নিশিরা গড়, এখানে শিব মন্দিরের কাজের ধারা আর এক) তথাপি প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে রস মাধুর্য্য পরিপ্লুত। যদিও প্রত্যেকটি ইটের স্থানে কোন ছাড় নাই, তবু কোনক্রমেই মনে হয় না যে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানে নৃত্যরত সখীদের দেখিলে সেকথা প্রমাণ হইবে।

রামায়ণ মহাভারতের কথাও বহু বিখ্যাত মন্দিরে বর্তমান। পৌরণিক বিষয় ছাড়া, অনেক বিষয়ই মন্দির গাত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। যথা, মুঘোল দৃশ্যাবলী, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও শিকার, কোথাও শোভাযাত্রা। দৈনন্দিন ঘটনা --- প্রসাধন, চরকাকাটা, তকলীকাটা, ঘরের কাজ, মোচে তা দেওয়া, আড্ডা, ক্রীড়া, পালোয়ান, বাঘের সহিত লড়াই। পাশ্চাত্য জীবন, ফিরিঙ্গীর বাঈনাচ দর্শন, ফিরিঙ্গী বনিকের জাহাজ, ফিরিঙ্গী কর্তৃক নারী ধর্ষণ, ফিরিঙ্গী প্রণয়, কামান দাগা (এ বিষয় --- টেরাকোটায় ফিরিঙ্গী জীবন --- ছোট ডকুমেন্টারী আছে)। শুধু টেরাকোটাতেই নহে, অন্যান্য জায়গায় যথা বালুচর সাড়ী, কাঁথা পট ইত্যাদিতে আমরা ফিরিঙ্গীদের কথা দেখিতে পাই।

রামায়ণ কথা, বর্গভীমা বিষ্ণুপুরে রামচন্দ্রের মন্দিরে চার বাঙলায় উল্লেখযোগ্য, বর্গভীমার মুখের আদল ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, চার বাঙলার কাজ আর ধরণের; এখানে রাম লক্ষ্মণ ছোট ইঁটের মধ্যে বন্দি নহে এগুলি বিরাট আকারের টেরাকোটা; (অবশ্য বিরাট আকারের টেরাকোটা মূর্তি আমরা গোপীবল্লভপুরে দেখিতে পাই, এগুলি দ্বারপাল) বিষ্ণুপুরের রামায়ণ পালা আৰ একভাবে লিখিত, একটি ইঁটে আছে রাবণের মাথাগুলি মাটিতে, পা শূন্যে, সম্মুখে হনুমান। জনসাধারণ যেভাবে নাটকের পরিণতি, দুর্বৃত্তের পরাজয় দেখিতে চাহে, ঠিক সেইভাবে লিখিত। ফলে বিষয়বস্তু নাটকীয়তার সহিত আর একের মনোভাব মিশ্রিত হইয়াছে।

মহাভারতের কথা তারাপীঠে, ইত্যাদিতে আছে। কিন্তু যেখানেই মহাভারতের কথা আছে, সেখানেই বিশেষ করিয়া ভীষ্মের শরশয্যা উৎকীর্ণ হইয়াছে, আটপুরের ছোট ইটের শরশয্যা আমাদের ভাল লাগে।

ষড়ভূজা, দশভূজা দুর্গা বহু মন্দিরগাত্রে দৃশ্যমান। ইলচোবায়, শিখরগাত্রে, সুন্দর একটি দেবীপ্রতিমা আছে, গুপ্তীপাড়ায় বাসুদেব মন্দিরে সুকুরিয়াতে সুন্দর দুর্গা প্রতিমা দেখা যায়। চার বাঙলায়, একটি মন্দিরে রণঙ্গিণ মূর্তিতে বিভূষিত। দেবীর সংহার ভাব এমন রূপায়িত হইয়াছে যাহা দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যে মত বা কম্পমান, রণনিনাদ ঝঙ্কৃত। খড়্গ্ হস্তে দেবী অসুর নিধনে ব্যগ্র।

মনে হয় বিরাট এক ভাস্কর্য্যের ছোট একটি ছবি দেখিতেছে।

মুঘোলদের জাঁকজমকের এখানে অনেক কথা আছে। মুখের ভাবে গুম্ফেদাড়িতে অদ্ভুদ পার্থিব ভাব, যদিও নাটকীয় ঘটনা ব্যতীত চোখের অভিব্যক্তিতে কোন মনোভাব ছায়াপাত করে নাই। দ্বন্দযুদ্ধ দেখিলেই বুঝায় যে এ-ক্ষেত্রে দেহের গতিকে সর্বস্ব করিয়া লইয়াছে। শিকার বা শোভাযাত্রার দৃশ্যকে বাস্তব করিয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাই দেখি কোথাও না কোথাও একটি কুকুর আছেই।

ফিরিঙ্গী জীবন। কবিকঙ্কন চাণ্ডীর পর নিশ্চয়ই সকল শিল্পীদের বিদেশীদের আচার ব্যবহার, সাজপোষাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যখন বিষয়বস্তুর মধ্যে আর কোন নূতনত্ব দেখা দেয় নাই (অবশ্য চিত্রশিল্পের কথা অন্য) তখন বাঙলার মৃৎশিল্পীদের চোখে ফিরিঙ্গী জীবন একটি নূতন বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দেয়।

ফিরিঙ্গীদের সাজপোষাকে দেখিলে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিত্রমও আছে, এবং মন্দিরগুলির স্থাপনা অনেক পরে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছে। মাথার টুপী সকল স্থানে এক নয়, নানান রকম টুপী, নানান রকমে চুলের কেয়ারী দেখা যায়। বিবিদের অঙ্গাভরণ প্রাচীন, পায়ে জুতাও আছে।

আটপুরের শিবমন্দির গাত্রে একটি বিবি আলেখ্য আছে। তিনি কেদারায় আসীন, সেই কেদারার নীচে একটি উলঙ্গ শিশু বসিয়া আছে, ইহার অর্থ যে কি তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না। প্রথমত, মনে হয় স্থানটিকে পরিপূর্ণ করবার নিমিত্ত ইহার অবতারণা, কিন্তু অন্যপক্ষে মনে হয় রাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রণয়পাশ-আবদ্ধ, সাহেবের কেদারার তলে একটি কুকুর আছে, তেমনই এখানে কেন হইল না। কালনায় ফিরিঙ্গী বাঈ নাচ দর্শন, জোউগ্রামে, উটের সোয়াৰ এবং ফিরিঙ্গী এবং

রমণী, আশুতোষ মিউজিয়মে মদ্যপান দৃশ্য পাদরী আমাদের বিস্মিত করে।

প্রথম প্রকাশ 'উত্তরকাল' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৭৬

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com